গ্রন্থকার আনন্দমূর্ত্তিজী

—আচার্য বিজয়ানন্দ অবধূত
প্রকাশন সচিব, আনন্দমার্গ

আমাদের আলোচ্য বিষয় গ্রন্থকার আনন্দমূর্ত্তিজী। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের স্থাপনা করেন। সংঘ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তিনি একের পর এক বই লিখতে শুরু করেন ও দীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায়। শুধু সংখ্যার বিচারেই নয়, গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ভাববৈচিত্র্য, রচনাশৈলীর বিচারেও গ্রন্থকার হিসেবে তাঁর স্থান যে কত ঊর্ধ্বে তা বিদগ্ধ পাঠকেরাই বিচার করবেন। আমি এখানে তাঁর বিপুল রচনাভাণ্ডার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলছি।

হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ১৯৫৫ সালে সংঘ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মার্গগুরু (তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৪) এক বিদগ্ধ, বহুদর্শী ও বহুভাষাবিদ্ গ্রন্থকার হিসেবে একের পর এক অমূল্য পুস্তক রচনা করতে থাকেন। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, সংঘ স্থাপনার আগে তিনি কি কিছু ভাবেন নি বা কিছু লেখেন নি? অবশ্যই ভেবেছিলেন—লিখেছিলেন। কোন প্রাক্‌প্রস্তুতি ব্যতিরেকে মানুষ কখনো এরকম সুশৃঙ্খলভাবে মনস্বী লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন না।

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার (তাঁর লৌকিক জীবনের নাম) ছিলেন বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী। শৈশব থেকেই বিভিন্ন ভাষা ও লিপি সম্বন্ধে ছিল তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে তিনি বাংলা, হিন্দী, ভোজপুরী ও অঙ্গিকা ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন। অল্প বয়সেই ইংরেজী ভাষাতেও তাঁর বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মে। বাল্যকাল থেকেই তিনি এত শ্রুতিধর ছিলেন যে সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘ স্তব-স্তোত্রগুলো একবার মাত্র শুণেই সুললিত কণ্ঠে নিখুঁত উচ্চারণ করে আবৃত্তি করতে পারতেন। আঠার বৎসর বয়সে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যয়ন কালে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা-গান-ছড়া লিখতেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর সেই তরুণ বয়সের রচনাগুলো পড়ে দারুণ বিস্মিত হতেন। ১৯-২০ বছর বয়সে তিনি দেড় শ'য়ের বেশী ইংরেজী কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন। মাঝে

মাঝে নাটক, প্রহসন, কবিতাও লিখতেন। কিন্তু কোন কিছু লিখে সেগুলো জমিয়ে রাখা তাঁর অভ্যাস ছিল না। কালক্রমে সেগুলো হারিয়ে যায়। থেকে যায় মাত্র তাঁর ২৩ বছর বয়সের রচনা দুটি শিশুসাহিত্যের বই—**'নীলসায়রে স্বর্ণকমল'** ও **'নীলসায়রের অতল তলে'** (রাঙা দাদুর ছদ্ম নামে)। ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রকাশিত একটি বাংলা পত্রিকা থেকে এই ধারাবাহিক রচনাগুলো উদ্ধার করা হয়। ওই বই দুটি পড়ে কারো সাধ্য নেই বলে দেন লেখকের বয়স ২৩ না ৬৩। কারণ রচনা দুটির বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা-কৌশল, রস পরিবেশনা, চরিত্র-চিত্রণ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, পরিবেশ-বর্ণনা ও শব্দচয়ন-চাতুর্য দেখে বিচক্ষণ পাঠক অতি সহজেই লেখকের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারবেন।

হ্যাঁ, আনন্দমার্গের ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয় হল গ্রন্থকার আনন্দমূর্ত্তিজী। যাই হোক, সংঘ তো তৈরী হল কিন্তু সংঘের কী আদর্শ, কীই বা উদ্দেশ্য? তখন সংঘের না ছিল কোন পত্র-পত্রিকা, না ছিল কোন বইপত্র। মার্গীয় আদর্শের প্রবক্তা ও প্রবর্তক হিসেবে শুরুতেই তিনি দু'টি কাজ করেন। একটি, ধর্মচক্র ও অপরটি, ধর্মমহাচক্রের প্রবর্তন। মার্গের সাধকরা প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়ে মার্গগুরু-নির্দিষ্ট ঈশ্বর-প্রণিধান করতেন ও সংস্থার কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতেন। এর নাম ছিল ধর্মচক্র। আর দূর দূরান্তের সাধকেরা যখন কোন একটি স্থানে মিলিত হয়ে দু'তিন দিন ধরে মার্গগুরুর উপস্থিতিতে সাধন-ভজন, সৎসঙ্গ ও সংস্থার কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন তাকে বলা হত ধর্মমহাচক্র। এই ধর্মমহাচক্রে মার্গগুরু ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে দীর্ঘ প্রবচন দিতেন। সেগুলোকে টেপ করে রাখা হ'ত। পরবর্তীকালে সেগুলো সংকলিত হয়ে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হতে থাকল। এইভাবেই তিনি তাঁর আইডিওলজিকে বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ "clear, concise and conclusive" রূপে উপস্থাপনার জন্যে প্রস্তুত করলেন বিপুল রচনাভাণ্ডার। আমার ধারণা, সংঘের বাইরে খুব কম লোকই মার্গগুরুর সেই বিপুল রচনাভাণ্ডারের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত আছেন। আবার বই তো অনেকে লেখেন। কেউ লেখেন গল্প, উপন্যাস, ৪০-৪৫টারও বেশী। কিন্তু ওই গল্প-উপন্যাসই। কাব্য, নাটক, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান বিষয়ে এক ছত্রও লিখলেন না। কেউ বা লেখেন দু'চারটে কাব্য-কবিতার বই বা দু'চারটে শিশুসাহিত্য বা প্রবন্ধ-নিবন্ধের বই, বিশাল জ্ঞানরাজ্যের দু'একটা বিষয় সম্বন্ধে পড়ার মত দু'চারটে বই। কিন্তু জীবনের নানান গুরুত্বপূর্ণ দিককে নিয়ে বৈদুষ্যমণ্ডিত রচনা ক'জন লেখেন? বলাই বাহুল্য, শ্রীপ্রভাতরঞ্জন ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থকার। আলোচ্য প্রবন্ধটি তাঁর সেই বহুমুখী রচনার সঙ্গে বিদগ্ধ পাঠককে পরিচিত করবার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

Scanned with CamScanner

জীবনবেদ

অধ্যাত্ম-জীবনের প্রারম্ভ-বিন্দু হল নৈতিকতা (morality) আর চরম বিন্দু হল নির্বীজ নির্বিকল্প সমাধি। নৈতিকতা সাধনার ভিত্তিভূমি, চরম লক্ষ্য (ultimate goal) নয়। তাই নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সাধকের চরম আদর্শ নয়। সাধনা মার্গে যাত্রা শুরু করবার ঠিক প্রথম পর্যায়ে সাধকের যে মানসিক সমতার প্রয়োজন সেটারই নাম নৈতিকতা। 'জীবনবেদ' পুস্তকটিতে এই নৈতিকতার সহজ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আধ্যাত্মিক নৈতিকতা দুটি স্তরে বিভক্ত— (১) যম, (২) নিয়ম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পাতঞ্জল যোগদর্শনের প্রথম দুটি অঙ্গ হল যম ও নিয়ম (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি)। যমের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি অনুশাসন— অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। নিয়মে রয়েছে আরও পাঁচটি অনুশাসন— শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। গ্রন্থকার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিবিজ্ঞানের এই দশটি উপযন্ত্রকে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। 'জীবনবেদ' তাই সাধক জীবনের প্রারম্ভ-বিন্দুর নীতি-নির্দেশনা সম্বলিত এক অমূল্য পুস্তক।

আনন্দমার্গ

নৈতিকতার পর আসছে আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে প্রয়োজন স্বচ্ছ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ। এজন্যে সাধকের প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে ধর্মতত্ত্বের মূল ভাবগুলোর সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া দরকার। সংঘ স্থাপনার শুরু থেকেই মার্গগুরু তাই এই পর্যায়ে রচনা করেন তাঁর 'আনন্দমার্গ' পুস্তকটি। ধর্ম কী, বিভু সত্তা কী, আমি কে বা কী, জগৎ ও ভূমার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী, জগতে মানুষের কীভাবে বাঁচা উচিত, মানুষের লক্ষ্য কী, আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা— ধর্মীয় দর্শনের এই মৌল ভাবগুলোর সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়ে সাধকোচিত এক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলাই গ্রন্থকারের এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।

আনন্দ-সূত্রম্

পুস্তকটি আনন্দমার্গের দর্শনশাস্ত্র। প্রাচীন সূত্র সাহিত্যের পরম্পরা অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় রচিত ৮৫টি সূত্র ও তাদের সংক্ষিপ্ত টীকা সম্বলিত এই অমূল্য পুস্তকটিতে গ্রন্থকার মার্গের মেটাফিজিক্স, এপিস্টেমলজি ও সমাজচিন্তা সম্বন্ধীয় নানান মৌল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। বইটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়

বোধির দ্যুতিতে ভাস্বর, স্বচ্ছ ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তার মৌলিকতায় পরিপূর্ণ ও আপ্তবাক্যের নির্ভুল সত্যে আধারিত। যাঁরা মার্গীয় দর্শনকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ও বিদগ্ধ জনোচিত ভাষায় জানতে আগ্রহী তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য এই 'আনন্দসূত্রম্' বইটি।

IDEA AND IDEOLOGY

'আনন্দ সূত্রম্' লেখার পেছনে লেখকের যে উদ্দেশ্য ছিল Idea and Ideology পুস্তকখানি লেখার পেছনেও একই উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজী জানা পাঠকের সামনে মার্গের মূল দার্শনিক ভাবধারা তুলে ধরার জন্যে ইংরেজী ভাষায় বইটি লেখা হয়েছিল।

আলোচনায় স্থান পেয়েছে সৃষ্টিচক্র, সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর ধারা, প্রাণ ও মনের উদ্ভব, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণেন্দ্রিয়, বৃত্তি, কোষ, পরমাত্মা, সাধনা, জীবন, মৃত্যু, সংস্কার, মানসাধ্যাত্মিক সমান্তরলতা ইত্যাদি। মার্গের দর্শনকে ভালভাবে জানতে বইটি বিশেষ সাহায্য করবে।

সুভাষিত সংগ্রহ (২২ খণ্ড)

ইতোপূর্বে বলেছি, মার্গগুরু সংঘ স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে দু'টি জিনিস প্রবর্ত্তন করেন— (১) ধর্মচক্র, (২) ধর্মমহাচক্র। ধর্মচক্র হচ্ছে যেখানে মার্গের গৃহীসাধক-সাধিকারা সপ্তাহান্তে একটি নির্দিষ্ট দিনে এক নির্দিষ্ট স্থানে এক সঙ্গে বসে ঈশ্বরোপাসনা করতেন বা করেন ও তৎপশ্চাৎ সংস্থার কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন। ধর্মমহাচক্র হল যেখানে দূরদূরান্তর থেকে গৃহী ভক্তরা শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে সমবেত হয়ে মিলিত ঈশ্বরোপাসনা, ধর্মালোচনা ও সংস্থার নানান কর্মসূচী নিয়ে বিশদ আলাপ-আলোচনা করতেন। মার্গগুরু স্বয়ং সেই ধর্মমহাচক্রগুলোতে উপস্থিত থেকে ধর্মদেশনা দিতেন। সব সময় তাঁর ধর্মমহাচক্রের ওই প্রবচনগুলো হত গভীর বৈদুষ্য ও বোধির দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। সেগুলো টেপ করা হত ও পরে সংকলিত হয়ে 'সুভাষিত-সংগ্রহ' নাম দিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করা হত। সর্বক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় থাকত ধর্মীয় ও ধর্মবিজ্ঞান সম্পর্কিত (ভারতীয় ধর্মদর্শনের জ্ঞানকাণ্ডের ওপর আধারিত)। যেমন— (১) বেদে ব্রহ্মবিজ্ঞান, (২) তন্ত্রে ব্রহ্মবিজ্ঞান, (৩) শ্রেয় ও প্রেয়, (৪) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, (৫) রথ ও রথী, (৬) জড় ও চেতনা, (৭) লোকায়ত ও লোকোত্তর, (৮) অণু ও ভূমা, (৯) অণুমন ও ভূমামন, (১০) ব্যাপ্তির ঐশ্বর্য্য, (১১) ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্, (১২) ভুবনেশমীড্যম্, (১৩) তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি, (১৪) যস্য দেবে পরাভক্তিঃ, (১৫) নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়, (১৬) বিবেকপঞ্চক, (১৭) পরম প্রশ্ন, (১৮) ব্রহ্মভাব ও মানজীবন, (১৯) সাধনা, সংঘর্ষ ও বিকাশ, (২০) বৃহতের আকর্ষণ ও সাধনা,

Scanned with CamScanner

আলোচনাগুলো 'কণিকায় প্রাউট' নাম দিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এগুলোতে গ্রন্থকার সমাজের ক্রমবিকাশ, নৈতিকতা, শিক্ষা, সামাজিক সুবিচার, বিচার ব্যবস্থা, অপরাধ-মনস্তত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণ, শিল্পনীতি, শিল্পে যান্ত্রিকীকরণ, ট্রেড ইয়ুনিয়ন আন্দোলন, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে সমবায় ব্যবস্থা, পণ প্রথা, বিশ্বশান্তি ও যুদ্ধ, বিশ্বৈকতাবাদ ও প্রাদেশিকতাবাদ, জাতিবাদ (Casteism), জাতীয়তাবাদ (Nationalism), বিশ্বরাষ্ট্র, বিশ্বভাষা ও বিশ্বলিপি, সমাজচক্র, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, সামাজিক মূল্য ও মানবিক মূল্যবোধ, দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকবাদ ও গণতন্ত্র, মানব প্রগতি, সৈদ্ধান্তিক তত্ত্ব ও প্রয়োগভৌমিক তত্ত্ব, সম-সমাজতত্ত্ব, প্রমা, মানুষের সাহিত্য ও শিল্প সাধনা, ব্লকভিত্তিক ও আন্তর্ব্লক পরিকল্পনা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা ও আন্দোলন, নারীর অধিকার, গণতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র, গণতন্ত্রের প্রকোষ্ঠীকরণ, সুসমঞ্জস অর্থনীতি, কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত এই সিরিজের গ্রন্থগুলোতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের প্রাউট থিয়োরি আজ বহু বিদগ্ধ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও করে চলেছে।

সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ ঃ

(১) লিপি পরিচয়, (২) নূতন বর্ণ পরিচয় (২য় খণ্ড), (৩) তাড়া-বাঁধা ছড়া, (৪) নীলসায়রে স্বর্ণকমল, (৫) হট্টমালার দেশে, (৬) হট্টমালার আরো গল্প, (৭) নীলসায়রের অতল তলে, (৮) প্রভাতরঞ্জনের গল্প-সঞ্চয়ন (১৪ খণ্ড), (৯) প্রভাতরঞ্জনের নাট্যসঞ্চয়ন, (১০) প্রভাত সাহিত্যে আক্‌লমন্দ, (১১) বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

মানব সমাজের বিকাশে সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। সাহিত্য মানুষের মনের খোরাক— মস্তিষ্ক-পুষ্টির মহৌষধ। অখাদ্য-কুখাদ্যে যেমন শারীরিক রোগ দেখা দেয় তেমনি অসংস্কৃতিমূলক সাহিত্যেও মননের বিকার ঘটে। তাই নন্দন জগতের হাতে খড়ি দেবার আগে কেবল ভাব ও ভাষার পুঁজি থাকলেই চলবে না— চাই গভীর প্রজ্ঞাস্নাত মরমী মন।

সাহিত্যের দু'টি প্রধান কর্ম। এক ঃ আনন্দ দেওয়া, দুই ঃ জগতের কল্যাণ করা। জগতের সব কিছুই চলে চলেছে— সুর-ছন্দ-বর্ণ-গন্ধের পারমার্থিক ভাবতরঙ্গে। সাহিত্য এই চলার পথকে শিল্প-সুষমার রসমাধুর্যে গতিময় করে তোলে—আনন্দ ধারায় সংক্লপ্ত করে তোলে। আবার কেবল আনন্দবিধানের ক্ষমতা থাকাটাই শেষ কথা নয়। সাহিত্যে থাকবে হিত বা কল্যাণের সুমধুর স্পর্শ। 'স-হিত' বা 'হিতেন সহ'— যে কোন অর্থেই হোক, সাহিত্যে কল্যাণ ব্রত থাকা চাই-ই। তাই সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের

স্পষ্ট সাহিত্যিক উদ্‌ঘোষ হল— "Art for service and blessedness"। নন্দনজ সমস্ত ফুলই ফুটে উঠবে সূর্যমুখী হয়ে আনন্দস্বরূপের মুখ চেয়ে।

মানব সমাজ ঘুরে চলেছে চক্রাকারে— এক যুগ থেকে অন্য যুগে। এক যুগের জরাতেই সূচিত হয় অন্য যুগের জন্মলগ্ন। আজকের সমাজ হৃতসর্বস্ব। শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, নীতিবোধ—সবেতেই আজ চলেছে চরম অবক্ষয়। সমাজ বৃক্ষের সমস্ত পত্রেই আজ হলুদ রঙ লেগেছে। একে আজ এক এক করে ঝরে যেতে হবে— ঝরিয়ে দিতে হবে। যুগ ক্রান্তির এই চরম মুহূর্তে রক্তিম কিশলয়ের মাঝে নোতুন কুঁড়ি ফোটানোর দায়-দায়িত্ব কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের। আর একাজে যিনি যত দক্ষ তিনি তত সার্থক যুগসাহিত্যিক। শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের বিপুল সাহিত্যসম্ভারে এই নবযুগের সূচনা। তাঁর সর্বতোস্পর্শী দর্শনে, তাঁর বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রতিটি পর্বে, তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে, ভাবে ভাষায় আকারে ইঙ্গিতে এই নব যুগ সূচনার প্রেরণাই প্রমূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। প্রভাত সাহিত্যের পরিসর দীর্ঘ। তার কিছু অংশ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যাক।

শিশুসাহিত্য ঃ 'হট্টমালার দেশে', 'হট্টমালার আরও গল্প', 'নীল সায়রের স্বর্ণকমল,' 'নূতন বর্ণপরিচয়' (১ম ও ২য় ভাগ), 'তাড়া-বাঁধা ছড়া' ইত্যাদি পুস্তকগুলো হল লেখকের অন্যতম শিশুসাহিত্য। স্বাদে গন্ধে বৈচিত্র্যে প্রতিটি রচনাই শিশুমনের উপযুক্ত খোরাক। শিশুমনকে আনন্দ দেবার জন্যে লেখক সঙ্গতভাবেই শিশুমনের প্রিয় উপকরণগুলো বেছে নিয়েছেনঃ রাজকুমার-রাজকুমারী, ভূত-প্রেত, দত্যি-দানব, ব্যঙ্গ মা-ব্যঙ্গমী, কুকুর-বেড়াল, মউমাছি, চকোলেট, পিঠের গাছ ইত্যাদি সহ রয়েছে মনভোলানো রকমারি খাদ্য। কিন্তু সাহিত্যিকের কলমের মুন্সিয়ানা হল শিশু-মনস্তত্ত্ব বিচার-কৌশলের অভিনব দক্ষতায়, এগুলো পরিবেশন করবার প্রকাশভঙ্গীতে। সাহিত্যিকের ভূত-প্রেত-ডাইনি বুড়ির গল্পে শিশুমনের সবুজ পাতায় সন্ত্রস্ততার বিদ্যুৎ খেলে যায় না। বরং ভূত-প্রেতদের সহজ সরল হার্দিক আচরণে শিশুমন যেন অলক্ষ্যে তৈরী হয়ে যায় তাদের সঙ্গে ভাব করার জন্যে। কথায় বলে 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ'। শৈশবাবস্থাই হল শিশুদের মনোভূমিতে জ্ঞানবৃক্ষের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। এ ব্যাপারে লেখকের লেখনী খুবই সজাগ।

শিশুর মাঝেই লুকিয়ে থাকে এক পরিণত মানুষের সম্ভাবনা। তাই এই সময়েই প্রয়োজন হয় উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষার। একানড়ে দাদার সঙ্গে পরিচয়ছলে কর্মফলের অনিবার্য ও ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে লেখক যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা আজীবন মনে থাকার মত। ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর দ্বারা অতিথি সৎকারের উপায় উদ্ভাবনে যে চরম আত্মত্যাগের নিখাদ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে তা আজকের সভ্য সমাজের স্বার্থপর মানুষদের মাথা লজ্জায় মাটিতে লুটিয়ে দেবে। এছাড়া 'সতত সৎকাজে রত

Scanned with CamScanner

থাকবে', 'যে মানুষের ক্ষতি করে সে মানুষ পদবাচ্য নয়', 'লোভ করিও না, ত্যাগশীল হও', 'পরোপকার মানব জীবনের ব্রত হওয়া উচিত', 'এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই নশ্বর', 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হবেই'— ইত্যাদি রত্নখচিত এক একটি নীতিপ্রস্তর দ্বারা যেভাবে শিশুমনের ভিত গাঁথা হয়েছে তাতে আগামী দিনে এক পূর্ণ নীতিবান মানুষের আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। একটু দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে প্রভাত-সাহিত্যের দীর্ঘ পরিসরের সমস্ত কিছু নীতিসমন্বিত।

গল্প ঃ রবীন্দ্রোত্তর গল্পসাহিত্যে এক নব অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে— প্রভাত-সাহিত্যের গল্প। গল্পের সঙ্গে প্রবন্ধ বা কথান্যাসের (fiction ঃএই অর্থে 'উপন্যাস' কথাটি ভুল) কেবল আকৃতিগত নয়, প্রকৃতিগত পার্থক্যও বিরাট। প্রবন্ধের গাঁথুনি কিছুটা দৃঢ় ও তা আনুষঙ্গিক সূত্রভিত্তিক, সাধারণ পাঠক সমাজে দুস্পাচ্যও। কথান্যাসের সুযোগ ব্যাপকতর। কিন্তু গল্প হল সহজ, সরল, সরস অথচ স্বল্পপরিসর, আবার এই স্বল্পায়তনেই লেখককে তাঁর ঘটনা অথবা কল্পনার পঞ্জীকরণ করতে হয়। সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতসহ বক্তব্যের মূল সুর তুলে ধরতে হয় নিখুঁতভাবে। এই সাহিত্যের আসরে ছোট গল্পের আবেদন ভিন্নতর।

গ্রন্থকারের গল্পগুলো "প্রভাতরঞ্জনের গল্পসঞ্চয়ন" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এখনও পর্যায়ক্রমে প্রকাশনধারা অব্যাহত রয়েছে। সমস্ত গল্পের বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ না থাকলেও সংক্ষেপে কিছু বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যাক। প্রভাত-সাহিত্যের গল্পগুলোকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

সামাজিক গল্প ঃ লেখকের অধিকাংশ গল্পই তাঁর নিজস্ব জীবন-সমুদ্রের অভিজ্ঞতা থেকে চয়ন করে নেওয়া কিছু মণি-মুক্তা। অধিকাংশ সামাজিক গল্পই আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ জীবনবৃত্তে ঘটে যাওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ। তাই গল্পগুলো খুবই জীবন্ত ও বাস্তবিক। অথচ অতি-বাস্তবতার কাল্পনিক রঙে বা অনাবশ্যক স্ফীতিতে এর সাহিত্যিক প্রমা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। শ্রীপ্রভাতরঞ্জনের কলানৈপুণ্য ও বিচক্ষণতায় প্রতিটি গল্পই হয়ে উঠেছে অনবদ্য।

লেখকের সামাজিক গল্পে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তা হল, তাঁর সামাজিক গল্পগুচ্ছে কোথাও মানসিক স্থূল বৃত্তিকেন্দ্রিক প্রেমের প্যান্‌প্যানানি নেই— যা বর্তমান যুগে অধিকাংশ লেখকের উপজীব্য। রোমান্সের ঘূর্ণীবাত্যায় বা চটুল ভাবালুতায় গল্পগুলোর কাঠামো কখনও আলুথালু হয়ে পড়েনি। রোমান্সের রোমাঞ্চকর জগতের চাবিকাঠি লেখক ঘুরিয়েছেন খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ভাবে যেখানে যেমনটি প্রয়োজন হয়েছে। সামাজিক গল্পে লেখকের চরণচারণা অতি গ্রাম্য জীবনের হাঁড়ি-

হেঁসেল থেকে কম্পিউটার জগতের রকেট-রোবোট পর্যন্ত। জীবন ও জগতের সর্বত্র তাঁর অবাধ বিচরণ।

সামাজিক চরিত্র চিত্রণে লেখক সিদ্ধহস্ত। 'দুই বাঁড়ুজ্জে', 'সেন্সার', 'বিয়ের ঝামেলা', 'খোলা থেকে নোলা', 'মণিদা তখন বরকর্তা' ইত্যাদি গল্পসমূহের চরিত্রগুলো পাঠকের কাছে একেবারে প্রাণবন্ত। কেবল গল্পের খাতিরেই কলমের মারপ্যাঁচ নয়। শ্রীপ্রভাতরঞ্জনের সমস্ত গল্পেই রয়েছে সামাজিক আচারসর্বস্ব ভাবজড়তার মূলে তীব্র কুঠারাঘাত। একটা উদাহরণ দিই ঃ "রেবার পদধ্বনি— ভুঁদিবালা সরে যাচ্ছে" গল্পে রেবার মুখ দিয়ে তার দুঃসাহসিক পদক্ষেপে লেখক যেভাবে সমাজের অমানবোচিত বিধিব্যবস্থার বুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কড়া চাবুক চালিয়েছেন তা বিবর্তনমূলক প্রগতিপন্থী চিন্তার ফসল, এক নবযুগের ইঙ্গিতবহ। 'শামিয়ানা নেতা', 'নেতা আর ন্যাতা এক নয়', হিপোক্রিসির বাংলা বল তো' ইত্যাদি গল্পগুলো কেবল হেসে হেসে পড়বার জন্যে নয় — তা আজকের ন্যায়নীতিবিবর্জিত ভঙ্গীস্বর্বস্ব নেতাদের চতুর অভিনয় অভিসন্ধি তুলে ধরতে সর্বার্থসার্থক, সচেতন পাঠক মাত্রেই একথা স্বীকার করবেন। এইভাবে দেখতে পাই পণপ্রথার বিভীষিকাময় পরিণতি, সামাজিক ন্যায়নীতিবোধের অভাব, পৌরাণিক তন্ত্রে নারকীয় শোষণ-যন্ত্রণা, পারিবারিক অশান্তির আগুন ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে প্রভাতরঞ্জনের গল্পে।

অতিপ্রাকৃত গল্প ঃ "প্রথমেই বলে রাখি, আমি ভূত-প্রেত-দানাদত্যি বা স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসী নই, কারণ ওগুলোর পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাইনি। আমি জানি ভূত-প্রেত, দানা-দত্যি, অলৌকিকত্বের ছাপমারা প্রতিটি জিনিস মনেরই খেলা। লৌকিক অথবা মানসিক পারিপার্শ্বিকতাভেদেই বা সম্ভাব্য মনের বিভিন্ন কোষে এদের উদয় ও লয় হয়ে থাকে"— অলৌকিকতা সম্পর্কে লেখকের ব্যষ্টিগত ধারণা এই রকম। শ্রীপ্রভাতরঞ্জনের অলৌকিক ঘটনাগুলো মানুষকে এক রহস্যঘেরা উর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়। হয়তো বা কিছুটা ডর-ভয়েরও উদ্রেক করে ;কিন্তু এই ভয় থেকে মনোরোগের সম্ভাবনা নেই— এই ভয়ের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে একটা দরদ-মেশানো ভালবাসা। জন্ম-মৃত্যুর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, পরজন্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগ, কর্মবন্ধনের করুণ আর্ত্তি ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের আপন অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও অভিমতসম্পৃক্ত গল্পগুলো প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত জগতের মধ্যে এক লৌকিক যোগসূত্র রচনা করেছে। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্প হল ঃ 'নীলকুঠির বিভীষিকা' ইত্যাদি।

পৌরাণিক গল্প ঃ 'ত্রিশঙ্কুর দশা', 'মহামায়ার অভিনয়', 'বন্ধের ঝামেলা শিবকেও পোহাতে হয়', 'ফল্গুতীরে', 'অক্ষয়বট' ইত্যাদি পৌরাণিক গল্প। শ্রীপ্রভাতরঞ্জনের 'গল্প-

Scanned with CamScanner

সঞ্চয়ন'-এর অনেকটা জায়গাই দখল করে রয়েছে পৌরাণিক গল্প। পুরাণের বাস্তব মূল্য না থাকলেও শিক্ষাগত মূল্য উপেক্ষা করা যায় না। এই কথাটি মনে রেখেই লেখক পুরাণের স্মৃতিচারণা করেছেন। লেখকের অধিকাংশ পৌরাণিক গল্পই হয়তো আমাদের পরিচিত বা অতি-পরিচিত। কিন্তু শব্দসাযুজ্যে ও রচনাচাতুর্য্যে লেখাগুলো এমনভাবে আধুনিক ঢঙে সাজিয়েছেন যে পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না—পড়া একবার শুরু করলে গল্পগুলো পড়ে শেষ করতেই হয়।

নমামি কৃষ্ণসুন্দরম্ ঃ

কৃষ্ণের দুই রূপ— ব্রজের কৃষ্ণ ও রাজা কৃষ্ণ। "ব্রজের কৃষ্ণের সঙ্গে মানুষ যতটা সহজভাবে পরিচিত হতে পেরেছে, পার্থসারথি কৃষ্ণের সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারেনি। ব্রজের কৃষ্ণ মধুর ও সেই মধুরতার মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ আর পার্থসারথি কৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে কঠোর ভূমিকা। কিন্তু সেই কঠোরতার সঙ্গে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ। দুই ভূমিকাতেই কৃষ্ণ ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর সামনে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সেই দৃষ্টান্ত মানুষের চোখের সামনে ধরে রাখার প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি"—এই মূল সত্যটিকে সামনে রেখে গ্রন্থকার অনবদ্য ভাষায় ও নিপুণভাবে কৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণের পদ্ধতিটা একবারে অভিনব। যেমন—এক কৃষ্ণ—দুই ভূমিকা, কোমলে ও কঠোরে, সাংখ্যদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রজের কৃষ্ণ, সাংখ্যদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে পার্থসারথি কৃষ্ণ, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে ব্রজের কৃষ্ণ, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে পার্থসারথি কৃষ্ণ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে ব্রজের কৃষ্ণ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে পার্থসারথি কৃষ্ণ, দ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে ব্রজের কৃষ্ণ, দ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে পার্থসারথি কৃষ্ণ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে ব্রজের কৃষ্ণ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে পার্থসারথি কৃষ্ণ, ভক্তিতত্ত্বের দৃষ্টিতে ব্রজের কৃষ্ণ ও পার্থসারথি কৃষ্ণ, পরিপ্রশ্নের দৃষ্টিতে ব্রজের কৃষ্ণ ও পার্থসারথি কৃষ্ণ, নন্দনবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্রজের কৃষ্ণ, নন্দনবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পার্থসারথি কৃষ্ণ ও মোহন বিজ্ঞানে কৃষ্ণ। বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার পর মোহন বিজ্ঞানে এসে দুই কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন হয়ে যাচ্ছেন।

১৯৭৮ সালে গ্রন্থকার ৩২৮ পৃষ্ঠার কৃষ্ণ বিষয়ক গ্রন্থটি রচনা করেন। দার্শনিক মতবাদগুলোতে কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা ছাড়াও লেখক কৃষ্ণ ও ষড়ঙ্গরীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি, প্রপত্তিবাদ, পার্থসারথি কৃষ্ণের জ্ঞানানুশীলন ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করেছেন। এককথায় কৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে বইটি অপরিহার্য।

নমঃ শিবায় শান্তায় ঃ

আজ থেকে প্রায় ৭০০০ বৎসর আগে তৎকালীন বৃহত্তর ভারতের উত্তরাঞ্চলে যে বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষ আর্য-মঙ্গোল-দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত সমাজে দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন সেই অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও বোধিদৃপ্ত মানুষটি ছিলেন সদাশিব যাঁর কাছে ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি চিরঋণী হয়ে আছে ও থাকবে। শিবকে যখন থেকে পাচ্ছি তখন থেকে তাঁকে সর্বানুস্যূত সত্তা হিসেবেই পচ্ছি। সেকালের সেই অপরিণত অল্পবুদ্ধি মানব সমাজে যখন যেখানে প্রয়োজন ঘটেছে, যেঁখানে যখন যেভাবে জল চুঁইয়ে পড়েছে শিব সেইখানটিতে ছাতা ধরেছেন। তাই শিবকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে আমরা বিচার করতে পারি না, ইতিহাস লিখতেও পারি না। সেই সঙ্গে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মানব সভ্যতা ও মানব সংস্কৃতির বিবর্তনে শিবের যে বিরাট ভূমিকা তাতে একথা বলাই সঙ্গত হবে যে শিবকে বাদ দিয়ে মানব সভ্যতা, মানব সংস্কৃতি দাঁড়াবার ঠাঁই পাবে না। কিন্তু মানব সভ্যতা ও মানব সংস্কৃতিকে বাদ দিলেও শিব স্বমহিমায় ভাস্বর থাকবেন। তাই পৃথিবীর বর্ত্তমান মানব সমাজে ও সুদূর ভবিষ্যতেও মানব সমাজের প্রতি সুবিচার করতে গেলে ও তার যথার্থ ইতিহাস লিখতে গেলে শিবকে বাদ দিলে চলবে না। আমাদের সমাজে যা কিছু সুন্দর মহান, যা আমাদের সমাজকে, সংস্কৃতিকে, সভ্যতাকে শক্তিমত্তায় পবিত্রতায় ও রসমাধুর্যে নিষিক্ত করছে তা সবাই সদাশিবের দান। সেযুগে বিবাহ প্রথা ছিল না। শিবই প্রথম সেই প্রথা প্রবর্ত্তন করলেন। তিনি একে একে সমাজকে দিলেন তন্ত্রবিজ্ঞান, নৃত্য, বাদ্য ও গীতিবিজ্ঞান ; তিনি শেখালেন চিকিৎসা বিদ্যা ..... এমনি আরও কত কী। তাঁর বিরাট অসাধারণ প্রভাবে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোল, আর্য সবাই একত্রিত হল। সে যুগে সবাই শিব পরিচয়ে নিজেদের গোত্র পরিচয় দিতেন। সবাই তাঁরই সম্মানে সম্মানিত বোধ করতেন। গ্রন্থকার সেই মহামানবের মহান ব্যষ্টিত্ব ও অবস্থানের কথা মনে রেখে শিবোপদেশ, দর্শনের আলোকে শিব ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করেছেন। ৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই অমূল্য পুস্তকটি শিবানুরাগী ও শিব বিষয়ক গবেষকদের কাছে জ্ঞানের খনিস্বরূপ।

বুদ্ধির মুক্তি—নব্যমানবতাবাদ ঃ

"মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে তার মননশক্তি, তার বুদ্ধি। এই বুদ্ধিকে আমি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব না— এর চেয়ে বেদনাদায়ক পরিস্থিতি আর কী হতে পারে। তাই মনের মুক্তি চাই। তারও আগে বুদ্ধির মুক্তি চাই। মানবতার সেবার জন্যে

Scanned with CamScanner

এই বুদ্ধিকে সর্ব প্রকার বন্ধন থেকে, ভাবজড়তা থেকে, নানাবিধ অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন মানুষ জাতির ভবিষ্যৎ স্বর্ণোজ্জ্বল হতে পারে না। যদি আজকের মানুষের সামনে স্বর্ণিম সুপ্রভাত আনতে হয় তাহলে অসীম সাহসে ভর করে এই ভাবজড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বুদ্ধির সর্বাত্মক মুক্তি ঘটাতে হবে।"

প্রশ্ন ওঠে, এই ভাবজড়তা কী জিনিস? গ্রন্থকার ভাবজড়তা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মানবসমাজের পক্ষে তথা মানবিক প্রগতির পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক বস্তু হল ভাবজড়তা (dogma)। ডগমা জিনিসটা কেমন? যেখানে যুক্তি নেই, বৌদ্ধিকতার সমর্থন নেই, বিতর্ক-আলোচনা নেই, আছে কেবল জোর-জবরদস্তি, বলা হয় এটা মানতেই হবে—এটাই ভাবজড়তা (dogma)।

লেখক এই গ্রন্থে নব্যমানবতাবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের সমাজে আত্মসুখতত্ত্ব, ভাবজড়তা, মানস-অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ, ভৌম ভাবাবেগ (Geo-sentiment), সামাজিক ভাবাবেগ (Socio-sentiment), প্রাক্‌সম আধ্যাত্মিক্ প্রবণতা (Proto-spiritualistic mind), বর্ণচোরা মাণিক (Demons in human form), metamorphosed-sentimental strategy ও Counterstrategy) ; মানসিক ভাবপ্রবণতা, যূথকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা—সর্বাল্প (Socio sentiment minimities), যূথকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা—সর্ববৃহৎ (Socio-sentiment excellensior), Internationalism, Pseoudo humanism, spirituality as a cult, spirituality as essence and spirituality as mission ইত্যাদি পর্যায়ে বৈয়ষ্টিক ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। পরিশেষে মানব সমাজের সর্বাত্মক কল্যাণের জন্যে নব্যমানবতাবাদের জয়গান গেয়েছেন। মানব জাতি আজ এক নবযুগের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। এই সময়ে আমরা কোন মতেই আমাদের মূল্যবান সময় অপচয় করতে পারি না। মানুষ জাতির মধ্যে যত শক্তি-সামর্থ্য নিহিত রয়েছে, তা সবেরই আজ সর্বাধিক উপযোগ ঘটাতে হবে।

আবার এই বিশ্বটা কেবল মানুষেরই বিশ্ব নয়, এই বিশ্ব সবারই। আমাদের এই যে যুগ, এটা হল নব্যমানবতাবাদের যুগ যে যুগে মানবতা সকলের জন্যে আর সবাইকে নিয়ে একটি নতুন সামাজিক সংরচনা, নব্যমানবতাভিত্তিক একটা নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

আজ মানবতা নবযুগের চউকাঠে এসে পৌঁছেছে। এই যুগে নানান যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে চলেছে ..... মনে রাখতে হবে মানবসমাজে ভাবজড়তা বা ডগ্‌মার যুগ

শেষ হয়ে গিয়েছে। ..... মানব সমাজ এক ও অবিভাজ্য। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে, সকলের কল্যাণের জন্যে একটা সামাজিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখতেই হবে।

আজ আমরা যা চাই তা হল মানুষ জাতির সার্বিক উন্নতি, আর মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীব জগতের, জড় ও চেতন সকলেরই উন্নতি ঘটবে। তাই আজ যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মানব অস্তিত্বের অধিরোহণ অর্থাৎ মানুষের ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। আমরা ভাবজড়তা চাই না, আমরা চাই অধিকতর বিচারশীলতা, যুক্তিপ্রবণ মানসিকতা যা মানুষকে পরম ধাম পরমপুরুষের দিকে পরিচালিত করবে। এই ধরণের নব্যমানবতাবাদই বিশ্বকে বাঁচাতে পারে, মানুষজাতিকে পরিত্রাণ করতে পারে। গ্রন্থকার এই পুস্তকটিতে এই ধরনের নব্যমানবতাবাদের জয়গান গেয়েছেন।

মানসাধ্যাত্মিক সাধনার স্তরবিন্যাস ঃ

জ্ঞান দুই প্রকারের—আপেক্ষিক জ্ঞান ও পারমার্থিক জ্ঞান। তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা আপেক্ষিক জ্ঞানকে প্রয়োজনীয় হলেও চরম ও পরম বলে মানতেন না। তাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানকে চরম ও পরম বলে মানতেন। তাঁদের উক্তি ছিল ঃ

"আত্মজ্ঞানং বিদুর্জ্ঞানং জ্ঞানান্যন্যানি যানি তু।
তানি জ্ঞানাবভাসানি সারস্য নৈব বোধনাৎ।।"

ভেতরের জ্ঞান, যেটা আত্মজ্ঞান— মনের নয়, আত্মার—সেটাই সত্যিকারের জ্ঞান। আর বাকী জ্ঞান হল জ্ঞানের অবভাস। তা থেকে মানুষ আসলে কিছুই জানতে পারবে না। আমাদের এই জগতে যে যত বড়ই বিদ্বান হোক, যত বড়ই পণ্ডিত হোক, যে নিজেকে যত বড় বলেই ভাবুক না কেন, সবাই এই অব-আত্মস্থীকরণের জগতের স্তরে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে। প্রকৃত জিনিস বুঝতে পারে না। এই আত্মস্থীকরণের জন্যে মানুষ নির্ভর করে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের ওপর কিন্তু আত্মস্থীকরণের এই তিনটি উপায় সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। গ্রন্থকার আত্মস্থীকরণের এই তিনটিরই অপূর্ণতা সম্বন্ধে যেমন বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি সত্যিকারের জ্ঞানক্রিয়া বা আত্মস্থীকরণের জন্যে (Subjectivisation of objectivities) সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যাপারটা আপেক্ষিক জগতের তত্ত্ব নয়, এটা সম্পূর্ণতই মানসাধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপার। এখানে গ্রন্থকার তাঁর বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি ও বোধি সহযোগে মানসাধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় তত্ত্বগুলোকে সাধকের সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি মানসাধ্যাত্মিক জগতের মুখ্য স্তর—যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার—এই চারটি পর্যায়ে চৌদ্দটি প্রবচন দেন। সেই প্রবচনগুলো সংকলিত হয়ে

Scanned with CamScanner

"মানসাধ্যাত্মিক সাধনার স্তরবিন্যাস" নামে প্রকাশিত হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানুষের কাছে পুস্তকটির মূল্য অপরিমেয়।

বর্ণবিজ্ঞান ঃ

গ্রন্থকার বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার শুরুতেই 'বর্ণবিজ্ঞান' পুস্তকখানি রচনা করেন। এখানে 'বর্ণ' মানে অক্ষর (letter)। চার শ' পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থখানি তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত এক সম্পূর্ণ অভিনব ও অনবদ্য পুস্তক। তাছাড়া এ পুস্তকখানিতে রয়েছে বাংলা তথা সংস্কৃত-সঞ্জাত ভারতীয় ভাষাগুলোর উচ্চারণরীতি, বানান, সিনট্যাক্স নিয়ে তুলনামূলক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অলোচনা। ভাষার বৈশিষ্ট্য, উপভাষার সঙ্গে ভাষার পার্থক্য সম্পর্কিত অধ্যায়গুলো ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের পক্ষে খুবই মূল্যবান। ভাষাশৈলী ও ভাষার বিকাশে শব্দ তৈরীর প্রবণতা, শব্দের ব্যুৎপত্তি, উৎসারণ ও বিবর্তন (derivation, emanation and distortion) প্রসঙ্গে আলোচনাগুলো ভাষাবিজ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য। এক কথায় বলতে গেলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকের পক্ষে এ পুস্তকখানি এক মূল্যবান খনিস্বরূপ।

মার্গগুরু সংঘ স্থাপনার শুরু থেকেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন ; কিন্তু সেগুলো গ্রন্থাকারে লিখিত হয় নি। অনেক পরে ১৯৮৩ সালে সংঘের ক্যাম্প-হেডকোয়ার্টার্স যখন (মূল কেন্দ্রীয় কার্যালয় আনন্দনগর) কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়, তখন থেকে প্রতি রবিবার ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ নিয়ে গ্রন্থকার ধারাবাহিক আলোচনা আরম্ভ করেন। কলকাতায় ১৯৮৩ সালের ১৯শে জুন থেকে একাদিক্রমে সেই আলোচনা চলতে থাকে ১৯৮৩ সালের ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত। রবিবাসরীয় এই আলোচনাগুলো সঙ্কলিত হয়ে ৪২১ পৃঃ সম্বলিত 'বর্ণবিজ্ঞান' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়।

লঘুনিরুক্ত ঃ

বৈদিক যুগে 'নিরুক্ত' বলতে বোঝাত দুরূহ বৈদিক শব্দের অভিধান। গ্রন্থকার রচনা করেছেন 'লঘুনিরুক্ত'। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হলেও আমরা বহু বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি, ভাবারূঢ়ার্থ ও যোগারূঢ়ার্থ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত নই। ফলে, বহু ক্ষেত্রে মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করে ফেলি যা বৈয়াকরণিক বিচারে ভুল। যেমন 'অভিজাত' (aristocratic) অর্থে বলি 'সম্ভ্রান্ত', 'পর্যাপ্ত বোঝাতে গিয়ে বলি 'অপর্যাপ্ত', 'সরব' বা 'মুখর' (vocal) বোঝাতে বলি

'সোচ্চার', 'আইবুড়ো' বোঝাতে বলি 'আইবড়', 'বৃহৎ শঙ্খ' বোঝাতে বলি 'মহাশঙ্খ' ইত্যাদি। আসলে 'সম্ভ্রান্ত' (সম্ — ভ্রম্ + ক্ত) মানে সম্যক্‌রূপে ভ্রান্ত অর্থাৎ যে বড় রকমের ভুল করেছে। 'সোচ্চার' (স + উচ্চার) মানে যে উচ্চার অর্থাৎ মল ত্যাগ করেছে, কিন্তু জলশৌচ করেনি। অনেক শিক্ষিত লোকও 'উচ্চার' শব্দের সঙ্গে 'উচ্চারণ' শব্দকে গুলিয়ে ফেলেন, 'উচ্চার' মানে বিষ্ঠা বা মল। 'মহাশঙ্খ' মানে বৃহৎ শঙ্খ নয়— মড়ার খুলি। ছ'শ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বিপুলকলেবর 'লঘুনিরুক্ত' গ্রন্থখানিতে লেখক প্রায় চার হাজার প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি ও সদর্থ নির্ণয় করেছেন। বাংলা ভাষা বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে বইখানি অপরিহার্য।

বাংলা ও বাঙালী ঃ

পৃথিবীর বুকে বাঙালী নামধারী জনগোষ্ঠীর সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আর এই বৈশিষ্ট্য সে পেয়েছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও রাঢ়ীয় নদীসমূহ বাহিত আর্য, মঙ্গোল ও অষ্ট্রিক সভ্যতার বিমিশ্রণের ফলশ্রুতি হিসেবে। বাঙালীর এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে তার সামাজিক সংরচনায়, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তায়, তার সাহিত্যে, শিল্পে ও কৃষিতে, তার স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে, এমনকি তার রাজনীতিতেও। গ্রন্থকার তাঁর ৫০০ পৃষ্ঠা-সংবলিত এই বৃহৎ গ্রন্থখানিতে বাংলা ও বাঙালীর সেকাল ও একালের বহু তথ্যই তুলে ধরেছেন। আলোচ্য সূচীতে স্থান পেয়েছে—তন্ত্র ও আর্যভারতীয় সভ্যতায় বাঙালীর স্থান, সভ্যতার আদিবিন্দু—রাঢ় (এই পর্যায়ে লেখক রাঢ়ের জনতা, জীবজন্তু, রাঢ়ের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, রাঢ়ের লিপি, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবকাব্য, রাঢ়ের মন্দির, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জলবায়ুর ওপর আলোকপাত করেছেন), গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ও বাঙলা, জাত-বাঙালী, বাঙলার নদীমাতৃক সভ্যতা, বাংলার ইতিহাসের টুকিটাকি, বাঙলার নববর্ষ ও বসন্তোৎসব, বাঙলার সঙ্গে মগধ, অঙ্গদেশ, মিথিলা, মণিপুর, অরুণাচল, ভুটান, নেপাল ও কেরলের যোগাযোগ, বাঙলার সামাজিক পরিচিতি, বাঙালীর ধর্মচিন্তা, শৌর্যে বাঙালী, কৃষিতে ও শিল্পে বাঙালী, বাঙলার আধুনিক মনীষী ইত্যাদি। এক কথায় আলোচ্য গ্রন্থে ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসের অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

নৃত্য-বাদ্য-গীত তিনে সংগীত ঃ

গীত, বাদ ও নৃত্য এই তিনে মিলে সংগীত। গীত হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা স্থূল জগতের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তার তরঙ্গটা বার বার মানস জগতের ভেতরে এসে পড়ে। গীতে যেমন ভাব রয়েছে সেই রকম ছন্দও রয়েছে, সুরও রয়েছে ; বাদ্য কিন্তু

Scanned with CamScanner

সে ধরণের ভাবাশ্রয়ী নয়। মনকে তরঙ্গায়িত করে সোজাসুজি চিত্তাণুকে তরঙ্গায়িত করা ও ভাবের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা বাদ্যের কাজ। আর নৃত্য হ'ল মানসিক ভাবকে ভাষার সাহায্য না নিয়েই ছন্দ ও মুদ্রার মাধ্যমে অভিব্যক্ত করা। পাশ্চাত্ত্য দেশীয় নৃত্য মুখ্যতঃ ছন্দপ্রধান কিন্তু প্রাচ্য নৃত্য মুখ্যতঃ মুদ্রাপ্রধান; তবে ছন্দের সাহায্যও নেয়। গ্রন্থকার তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক এই গ্রন্থটিতে নন্দনবিজ্ঞান ও মোহনবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

যৌগিক চিকিৎসা ও দ্রব্যগুণ ঃ

চিকিৎসার উদ্দেশ্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিধান। তাই এতে চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষের সম্মান রক্ষার প্রশ্নটা বড় নয়— বড় কথা হচ্ছে রোগীর কল্যাণ। বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা বিকার- প্রাপ্ত দেহযন্ত্রকে যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায় ঠিক তেমনি যৌগিক আসন-মুদ্রাদির সাহায্যে অধিকতর নিরাপদ ও নিখুঁত ভাবে দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। প্রতিটি ব্যাধির চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। পুস্তকে বর্ণিত আসন-মুদ্রাদির অভ্যাস করে লোকে রোগমুক্ত হোক— এটাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তবে ভাল হয়, যদি জনসাধারণ আসন-মুদ্রাদির ব্যাপারে নিজে কোন ঝুঁকি না নিয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। আসন-মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে সহজলভ্য কিছু কিছু ফলপ্রদরূপে পরীক্ষিত ঔষধের নাম ও তাদের ব্যবহার বিধিও দেওয়া হয়েছে। পুস্তকটিতে আলোচ্য সূচী হল ঃ অজীর্ণ রোগ, হার্নিয়া, অম্লরোগ, অর্শ, আমাশয়, সিফিলিস, ক্যান্সার, কুষ্ঠ, কৃশতা, গরল ও কাউর (Eczema), ধাতুদৌর্বল্য, পক্ষাঘাত, পাকস্থলীর ক্ষত বা আন্ত্রিক ক্ষত, পিত্তাস্মরী, বহুমূত্র, প্রমেহ, বধিরতা, বাতরোগ, হাইড্রোসিল, মূত্রাস্মরী ইত্যাদি।

মহাভারতের কথা ঃ

মহাভারত পৃথিবীর অন্যতম এপিক— আবার ইতিহাসও। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনগণের ওপর এর প্রভাব অপরিসীম। মহাভারতের প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত, তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষকে অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। গ্রন্থকার নাতিবৃহৎ এই পুস্তকটিতে আলোচনা করেছেন—মহাভারতের নামকরণের তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণই এই মহাভারতের নায়ক, মহাভারতীয় যুগের শিক্ষাপদ্ধতি, চিকিৎসা পদ্ধতি, সামাজিক সংরচনা, নৈতিক মান, শ্রীকৃষ্ণের কর্মধারা, মহাভারতের বিশেষ বিশেষ চরিত্র—ভীষ্ম,

দ্রোণ, গান্ধারী, বিদুর, দ্রৌপ্রদী ইত্যাদি, কর্ণ চরিত্রের মুল্যায়ন, মহাভারতীয় যুগের রূপকার শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, মহাসম্ভূতি শ্রীকৃষ্ণ, মহাবিশ্বের পরিকল্পনা।

বর্ণবিচিত্রা (৮ খণ্ড) ঃ

১৯৮৩ সালের ১৩ই নভেম্বর থেকে মার্গগুরু বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণকে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে এক বিশেষ আঙ্গিকে প্রতিটি বর্ণকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা শুরু করেন, ও সেই আলোচনা চলতে থাকে ১৯৮৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই পর্যায়ের আলোচনাগুলো 'বর্ণবিচিত্রা' নামে ধারাবাহিকভাবে ৮টি পর্বে প্রকাশিত হয়। এই বর্ণবিচিত্রা সিরিজে গ্রন্থকারের রচনা সর্বসাকুল্যে ১৮০০ পৃষ্ঠা। লেখক প্রতিটি বর্ণের আলোচনা করেছেন যথাক্রমে তার ভূমিকা, উচ্চারণ, উৎস, অর্থ, তৎসম, তদ্ভব, দেশজ ও বৈদেশিক শব্দে সংশ্লিষ্ট বর্ণটির ব্যবহার, সন্ধি, উপসর্গ, বীজমন্ত্রে ও শব্দের আদিতে সংশ্লিষ্ট অক্ষরটির প্রয়োগ নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষা ও ব্যাকরণে বর্ণের এই ধরণের বহুধা-বিচিত্র ব্যবহারের জন্যে এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলোর নামকরণ করা হয়েছে 'বর্ণবিচিত্রা'। শুধু বাংলা ভাষাতেই নয়, পৃথিবীর কোন ভাষাতেই এক একটি বহুধা-বিচিত্র বর্ণের ব্যবহার নিয়ে এ জাতীয় কোন পুস্তক আছে বলে মনে হয় না।

শব্দচয়নিকা (২৬ খণ্ড) ঃ

১৯৮৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে মার্গগুরু শুরু করেন অন্য এক নূতন পর্যায়ের রচনা। কোন ভাষার স্বীকৃতির জন্যে অপরিহার্য উপাদানগুলোর অন্যতম হল শব্দসম্ভার (vocabulary)। এই শব্দসম্ভার গড়ে ওঠে মানব মনীষার বহুমুখী অভিব্যক্তির ধারাপথ বেয়ে; যেমন কতকগুলো শব্দ দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিছু শব্দ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা বা জীববিদ্যার সঙ্গে, কতকগুলো চিকিৎসা বা সঙ্গীতবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। এখন প্রতিটি শব্দের উদ্ভবের পেছনে থেকে যাচ্ছে তার ব্যুৎপত্তি, ভাবারূঢ়ার্থ ইত্যাদি। যেমন, আমরা বাংলায় বলি 'আঁত' (সে আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলে)। এখন কোন পাঠককে বৌদ্ধিক ভূমিতে দৃঢ় করবার জন্যে শব্দটির উদ্ভব ও প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। তাই বলতে হবে, এই 'আঁত' শব্দটি আসছে সংস্কৃত 'আত্মা' শব্দ থেকে। সংস্কৃত 'আত্মা' মাগধী প্রাকৃতে, বিশেষ করে পশ্চিমী অর্ধ মাগধীতে হয়ে যায় 'অত্তা' (অত্তা হি অত্তানং নাথ), পূর্বী অর্ধমাগধীতে হয় 'আত্তা'। তাই থেকে বর্তমান বাংলায় 'আঁত্তা'। 'আঁত্' শব্দটি 'আত্তা'-রই সংক্ষিপ্ত রূপ। 'আঁতে ঘা' মানে আত্মায় আঘাত। বহুভাষাবিদ্ ও নবতম ভাষাবিজ্ঞানের পথিকৃৎ গ্রন্থকার এইরকম বর্ণানুক্রমে

Scanned with CamScanner

অসংখ্য শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এক একটি শব্দের আলোচনা করা হয়েছে বিশ-ত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ১৯৮৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২০ সালের ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে গ্রন্থকার এই রকম আলোচনা করেছেন। এটি প্রকৃত প্রস্তাবে শব্দকোষ পর্যায়ের রচনা। প্রায় ৬০০০ হাজার পৃষ্ঠায় লেখক মুখ্যতঃ ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান, গৌণতঃ মানব মনীষার অন্যান্য দিকগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের কাছে এই 'শব্দচয়নিকা' সিরিজটি অত্যন্ত মূল্যবান।

কৃষিকথা (দুই খণ্ড) ঃ

আমরা আগেই বলেছি, গ্রন্থকারের সব বিষয়েই ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ ও অগাধ পাণ্ডিত্য। তাই দেখতুম, জ্ঞাতব্য বিষয় সামনে এলেই তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের পুরো বিষয়টি সম্পর্কে খুঁটিয়ে বলতেন। তাই তাঁর জ্ঞানানুশীলনে উদ্ভিদ, জীবজন্তু, কৃষি কোন কিছুই বাদ পড়ে নি। তাঁর কৃষি বিষয়ক আলোচনাগুলো 'কৃষিকথা' শিরোনামায় দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়— আলোচ্য বিষয়সূচী হল ; তাল, নারকোল, খেজুর, সুপারী, কলা, গোলাপ, বেল, বেগুন, কাঁঠাল, তেঁতুল, কুঁদরি, ফুটি, আদা, হলুদ, গোলমরিচ, আম, জাম ইত্যাদি।

অভিমত (৮ খণ্ড)

সমাজ, রাষ্ট্র, নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব, শিল্প, আধ্যাত্মিকতা, ভাষা, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে মার্গগুরু তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন। সেগুলো 'অভিমত' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এযাবৎ আট খণ্ডে। ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের কাছে প্রতিটি খণ্ডই মূল্যবান বিবেচিত হবে।

প্রভাত-সঙ্গীত ২০১ খণ্ড ; (৫০১৮টি গান) ঃ

সঙ্গীত জগতে এক অনবদ্য ও অভিনব বিষয় হল প্রভাত-সঙ্গীত। ১৯৮২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বিহারের দেওঘরে মার্গগুরু প্রভাতসঙ্গীতের রচনা শুরু করেন আর ১৯৯০ সালে ২০শে অক্টোবর (মহাপ্রয়াণের পূর্ব দিন) রাত্রি সাড়ে এগারটায় প্রভাত-সঙ্গীতের শেষ ৫০১৮ সংখ্যাক গানটি রচনা করেন। গানটি ছিল প্রস্তাবিত আনন্দমার্গ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত। ভাব, ভাষা, সুরবৈচিত্র্য ও ছন্দমাধুর্যের দিক থেকে প্রভাত-সঙ্গীত অবশ্যই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। তাছাড়া প্রভাত-সঙ্গীতে রয়েছে নানান পর্যায়ের নানান আঙ্গিকের গান। যেমন ভক্তিগীতি, ভাবসঙ্গীত, ঋতু পর্যায়ের গান, মিষ্টিক্ গান,

অনুষ্ঠানাঙ্গিকের গান, গণসঙ্গীত, দেশপ্রেমের গান, ঝুমুর, বাউল, কীর্ত্তন ও ভাঙ্গা কীর্ত্তন, গজল ও ভাঙ্গা গজল, কাওয়ালী, শিবগীতি, কৃষ্ণবিষয়ক গান ইত্যাদি আরও কত কী! মার্গগুরু নিজেই একাধারে সঙ্গীত-রচয়িতা ও সুরকার—লিখেছেন বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, অঙ্গিকা, ভোজপুরী, মৈথিলী, মগহী ইত্যাদি নানান ভাষায়। এক একটি খণ্ডে স্বরলিপি সহ ২৫টি করে গান স্থান পেয়েছে।

আমাদের প্রতিবেশী পশু ও পক্ষী ঃ

নব্যমানবতাবাদী প্রভাতরঞ্জনের দৃষ্টিতে মানুষ যেমন ঈশ্বরের মহৎ সৃষ্টি তেমনি মনুষ্যেতর জীবজন্তুর মূল্যও কম নয়। তাই উন্নতধী মানুষের পক্ষে তার প্রতিবেশী পশু-পক্ষীর প্রতি এক বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রয়েছে। 'জীবঃ জীবস্য ভোজনম্' বা 'জোর যার মুলুক তার' নীতি অনুসরণের মধ্যে মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। আলোচ্য পুস্তকের নামকরণের মধ্যেই লেখকের সেই নব্যমানবতবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট। এতে আলোচনায় স্থান পেয়েছে— ঈগল, চাতক, পানকৌড়ি, ফ্ল্যামিঙ্গো, গুয়ে ময়না, চড়ুই, পায়রা, কাক, পেঁচা, বিভিন্ন ধরণের সাপ, কণ্ডোর, ময়ূর, শূকর ইত্যাদি।

প্রভাতরঞ্জনের ব্যাকরণবিজ্ঞান (৩ খণ্ড)

ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ নিয়ে লিখিত তিন খণ্ডের সিরিজ— প্রতি খণ্ডে ৫০০ পৃষ্ঠা। ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের ওপর লেখা বাজারী বইগুলো থেকে এই সিরিজের কতই না পার্থক্য! যেমন প্রথম খণ্ডের প্রথমেই লেখক বাংলা-সংস্কৃতের ভাষাগত ধ্বনিবিজ্ঞান ও বৈদেশিক ভাষার ভাষাগত ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ২০ পৃষ্ঠা ধরে। অন্যান্য খণ্ডগুলোতে আলোচিত হয়েছে ভাষার উদ্ভব ও বৈচিত্র্য, কারক-বিভক্তি, বাংলা শব্দসম্ভারে ফারসী, বাংলায় শব্দ তৈরীর প্রবণতা ইত্যাদি। তাছাড়া এই সিরিজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ 'মূল ধাতু ও শব্দসম্ভার' অধ্যায়টি— প্রায় ৩০০ পাতা ধরে।

নারীর মর্যাদা/The Awakening of Women

গ্রন্থকার শ্রীআনন্দমূর্ত্তিজী শুধুমাত্র এক অসাধারণ অধ্যাত্মগুরুই ছিলেন না, সমাজজীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা ছিল বিস্তর। সমস্যাজর্জরিত বিংশ শতাব্দীর বহুতর আন্দোলনের অন্যতম হ'ল পরিবেশ সম্বর্ধন ও নারীমুক্তি আন্দোলন। বলা বাহুল্য, ইতিহাসবেত্তা ও সমাজসচেতন গ্রন্থকারের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সমাজের নানান অসাম্য-বৈষম্য, অত্যাচার-অবিচারের নগ্ন দৃশ্য

Scanned with CamScanner

সহজেই ধরা পড়েছিল। সুস্থ ও বলিষ্ঠ সমাজ গড়তে গেলে, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ঐক্যের পরিবেশ রচনা করতে গেলে অন্যায়-অবিচার-অসাম্যের অবসান অপরিহার্য। সমাজের অন্যান্য অংশের মত নারীসমাজও দীর্ঘদিন ধরে পুরুষশাসিত সমাজের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। যুগে যুগে সমাজে নারীর অবস্থান, তার ভূমিকা ও মর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে গ্রন্থকার যে সব আলোচনা করেছিলেন সেগুলোকে একত্রে সংকলিত করে "নারীর মর্যাদা" বইখানি প্রকাশিত হয়। দ্রুত সম্পাদনা করতে গিয়ে বাংলা সংস্করণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবচন ছেড়ে যায়। পরে চীনের পিকিংয়ে নারীর স্বাধিকার বিষয় নিয়ে বিশ্বসম্মেলনের সময় The Awakening of Women নামে এর পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৩৬৮ পৃষ্ঠার এই মূল্যবান বইখানি বহুদেশের প্রগতিশীল নারী সমাজের কাছে নিদারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইতালিয়ানা, ফরাসী, জার্মান, চৈনিক, কোরিয়ান, স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ ইত্যাদি ভাষায় এর অনুবাদের কাজ চলছে।

Yoga Psychology

আমরা বুঝি বা না বুঝি, এটা ধ্রুব সত্য যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরেও রয়েছে একটা বিশাল জগৎ— বুদ্ধির জগৎ ও বোধির জগৎ। বড় বড় মনীষীদের বই পড়ে বা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠভবনে বসে নিয়মিত জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে মানুষের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ কিছুটা হয় বটে কিন্তু মানুষের পরম সম্পদ মাননিকতার সেটাই চরম উৎকর্ষ নয়। চরম বিকাশ হয় তখন যখন মানুষ জ্ঞাতসারে তাঁর বৌদ্ধিকতা বা মাননিকতাকে সূচাগ্র করে আত্মিকতার প্রোজ্জ্বল জগতে অবগাহন করে। এটাই মিষ্টিসিজম্..... A constant endeavour to find out the eternal link between the finite and the Infinite. মানসাধ্যাত্মিক জগতের সেই বিশেষ স্তর সম্বন্ধে গ্রন্থকার মাঝে মধ্যে বহু মূল্যবান তত্ত্বের ইঙ্গিত দিতেন। তারই কিছু অংশকে সংকলিত করে Yoga Psychology (১৭০ পৃষ্ঠা) পুস্তকখানি সংকলিত হয়। গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়সূচীর কয়েকটি হল ঃ

1) Mysticism and Yoga ;
2) Cerebral and Extra-cerebral Memory ;
3) Ghosts and Evil Spirits ;
4) Food, Cells, Physical and Mental Development ;
5) Dream, Telepathic Vision and Clairvoyance ;
6) Faculty of Knowledge 1-5 ;

7) Bio-Psychology ;
8) Biological Transformation Associated with Psychic Metamorphosis and Vice-Versa.
9) Mind Grows in Magnitude ;
10) The Cult of Spirituality—the Cult of Pinnacled Order;
11) The Human Body is a Biological Machine.

ফলিত মনস্তত্ত্ব ও মানসাধ্যাত্মিক জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে কৌতূহলী গবেষকদের কাছে বইখানি অপরিহার্য।

Discourses on Tantra

দার্শনিক বিচারে আনন্দমার্গ Absolute Monism-য়ে বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক অনুশীলন পদ্ধতিগত বিচারে ভারতীয় যোগ (রাজাধিরাজ যোগ) ও একেশ্বরবাদী তন্ত্রে বিশ্বাসী। শঙ্করের মায়াবাদী অদ্বৈতবাদ, হঠযোগ, পৌরাণিক মূর্ত্তিপূজা ও তথাকথিত তন্ত্রের স্থূল বিকৃত পঞ্চ ম-কার তত্ত্বের সঙ্গে আনন্দমার্গের একেশ্বরবাদী দর্শন ও সাধনার মেরুগত পার্থক্য। মার্গগুরু আনন্দমূর্ত্তিজী তাঁর তিন শতাধিক দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক প্রবচনে তাঁর দার্শনিক অবস্থান স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে গেছেন। তন্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁর প্রবচনগুলো একত্র সংকলিত হয়ে Discourses on Tantra নামে দুই খণ্ডে (প্রতি খণ্ডে ৩০০ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ঃ 1) Tantric Philosophy ; 2) Tantric Science ; 3) Tantric History.

দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে The Nature and Practice of Tantra. এর প্রতিটি আলোচনাই অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সারগর্ভ। মানসাধ্যাত্মিক জগতে তন্ত্র চেতনার সূক্ষ্ম তাৎপর্য সম্বন্ধে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মানুষের সংখ্যা অতি বিরল। তাছাড়া ভারতীয় সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতিতে ৭০০০ বছর ধরে শৈবতন্ত্র যে কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ঝলক পেতে গেলে এই গ্রন্থের Tantra and Indo-Aryan Civilisation, The Acoustic Roots of Indo-Aryan Alphabet ; The Psychology Behind the Origin of Tantric Deities ; Tantra and Its Effect on Society ; Shiva Through the Ages ইত্যাদি প্রবচনগুলি অবশ্যই অতি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

মানুষের সমাজ (২ খণ্ড)

গ্রন্থকার আনন্দমূর্ত্তিজী যে একাধারে ধর্মগুরু ও সমাজগুরু— একথা সর্বজনবিদিত। শুধু লোকোত্তর জীবনটাই নয়, মানুষের লোকায়ত জীবনকেও কীভাবে ছন্দোবদ্ধ প্রমা-

Scanned with CamScanner

ঋদ্ধ ও আনন্দোচ্ছল করে তোলা যায় সে বিষয়েও তিনি সমভাবে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৫৫ সালে সংঘ স্থাপন করেই তিনি যেমন তাঁর প্রবর্ত্তিত ভাবাদর্শের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রস্তুত করতে থাকেন তেমনি পাশাপাশি তাঁর মৌলিক সমাজ চিন্তার কথাও ব্যক্ত করতে থাকেন। "মানুষের সমাজ" বই দু'খানি তাঁর সেই সময়কার রচনা।

প্রথম খণ্ডে রয়েছে ৫টি নিবন্ধ—নীতিবাদ, শিক্ষা, সামাজিক সুবিচার, বিচার, বিভিন্ন বৃত্তি। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ৪টি নিবন্ধ — ক্ষত্রিয় যুগ, বিপ্র যুগ, বৈশ্য যুগ, শূদ্র বিপ্লব ও সদ্‌বিপ্র সমাজ।

এই পৃথিবীতে পুরোপুরি কেউই পূর্ণ নয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের অনুপপত্তি-অপূর্ণতা অন্যের সাহায্যে পূরণ করে নেয়। একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী যখন এইভাবে "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" নীতি মেনে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেদের পূর্ণ করার চেষ্টা করে, সেটাকেই নাম দেওয়া হয় 'সমাজ'। সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন : "সমানং এজতি ইতি সমাজঃ অর্থাৎ সবাই মিলে যখন ঠিক করলে যে তারা এক সঙ্গে চলবে, সুখে দুঃখে এক সঙ্গে থাকবে তখন তাদের মিলিত নাম সমাজ ..... সমাজ এমনই এক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের তীর্থযাত্রা যেখানে এক সঙ্গে চলতে গিয়ে সকলেই বিস্ময়কর ব্যষ্টিত্বের অধিকারী হয় যা তাদের বৈয়ষ্টিক ও সামূহিক জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।" আদর্শ সমাজের এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে বহুতর মৌলিক উপাদান ও উপকরণ আবশ্যক। তারই কয়েকটি, যেমন নীতিবাদ, আদর্শ শিক্ষা, সামাজিক সুবিচার, পরিচ্ছন্ন বিচার-ব্যবস্থা, মানুষের সৎজীবিকা নিয়ে গ্রন্থকার বিশদ সারগর্ভ আলোচনা করেছেন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে সমাজ চক্র, শূদ্র, ক্ষত্রিয় বিপ্র ও বৈশ্য শাসনাধীন সমাজ, সদ্‌বিপ্র সমাজের কথা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই শূদ্র-ক্ষত্রিয়-বিপ্র-বৈশ্য শব্দগুলির সঙ্গে সনাতনী হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই চারটি বর্ণের পৃথক পৃথক মানসিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মানব ইতিহাসে সমাজচক্রের গতিপ্রবাহ চিরন্তন। স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের পথে চললে এই বর্ণচক্রে বা শ্রেণীচক্রে বর্ণবিশেষের প্রাধান্য থাকবেই। তাই সমাজচক্রের এক পূর্ণ পরিক্রমার পর প্রতিটি বর্ণের ভূমিকার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় পরিক্রমায় সমাজের শাসনভার বর্ণবিশেষের হাতে তুলে না দিয়ে নোতুন নেতৃত্বের কথা বলেছেন। একাধারে আধ্যাত্মিক সাধক, বুদ্ধিমান ও সাহসী এই নোতুন নেতৃবর্গ (গ্রন্থকারের ভাষায় সদ্‌বিপ্র)

' গ্রন্থকারের একান্ত স্নেহভাজন, পরম ভরসার পাত্র। তাই গ্রন্থের উপসংহারে তিনি আগামী দিনের নোতুন বিশ্বের রূপকার হিসেবে এই সদ্‌বিপ্রের অভ্যুদয়ই সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছেন।

এই রকম আরও বেশ কতকগুলি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন গ্রন্থকার। যেমন— "কৃষ্ণতত্ত্ব ও গীতাসার", "দেশপ্রেমিকদের প্রতি", "আজকের সমস্যা", "Discourses on Prout", "পথ চলতে ইতিকথা", 'প্রয়োজনের পরিভাষা" ইত্যাদি ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, অসাধারণ বুদ্ধি ও বোধির অধিকারী গ্রন্থকারের প্রতিটি পুস্তকই বিরল মৌলিকত্বের দাবীদার। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ জনেরা তাই তাঁর রচনার সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েন। স্বাভাবিক ভাবেই তাই বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসাহী গবেষকরা তাঁর আইডিওলোজির বিভিন্ন দিক দিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ, ভাষা ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়ান, চাইনীজ, জাপানীজ, কোরিয়ান তথা ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় তাঁর বইগুলির অনুবাদের কাজ চলছে। আশা রাখি, আগামী বছর গুলোতে আরও অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী মানুষ এই লোকোত্তর প্রতিভাধর মানুষটির যুগান্তকারী অবদানগুলির কথা জানতে পারবেন ও তাঁর আদর্শ ও স্বপ্নকে রূপায়িত করার চেষ্টা করবেন।

Scanned with CamScanner